বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি

শামসুজ্জামান খান

একটি জাতির জনক হওয়া খুব বড় কথা নাও হতে পারে। জিন্নাওতো পাকিস্তানের জনক। কিন্তু তাঁদের দুজনের মধ্যে পার্থক্যটা আকাশ পাতালের। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সেখানেই। বঙ্গবন্ধুর সেই অসামান্য রাজনৈতিক সাফল্য, দূরদৃষ্টি ও রাষ্ট্র চিন্তার একটা চুম্বকই আমরা এখন সংক্ষেপে পেশ করবো।

১. বাংলাদেশ নাম ঃ এই নাম তাঁরই দেয়া। তিনি ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, আবুল ফজল প্রমুখ খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীকে পূর্ব বাংলার একটি নাম ঠিক করার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁরা ঐতিহাসিক দিক বিচার বিবেচনা করে কেউ বলেন 'বঙ্গদেশ' কেউ বলেন 'বাংলা' কেউ 'বঙ্গ'। সেই সঙ্গে তাঁরা বলেন আদি বঙ্গদেশ বলতে পূর্ব বাংলাকেই বুঝায়। ১৯৬৯-এর ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিক আলোচনায় বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলেন ঃ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে জনগণের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি আজ থেকে বাঙালি জাতির এই আবাস ভূমির নাম হবো 'বাংলাদেশ'।

১.২ জাতীয় সঙ্গীত ঃ জাতীয় সঙ্গীতও বঙ্গবন্ধুরবই নির্বাচন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসতেন, তাঁর কবিতা যখন তখন আবৃত্তি করতেন এবং তাঁর মনের গহীন ভেতরে বাংলার নিসর্গ ও তার ভেতরে ভেতরে সংস্থাপিত জনজীবন তাঁর মনের ভেতরে যে আবহ তৈরি করছিলো - তাতে 'আমার সোনার বাংলাকে যে তিনি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যদা দেবেন এটাই স্বাভাবিক;

২. ষাট দশক থেকেই তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন- তাঁর ষাট ও সত্তর দশকের বক্তৃতা বিবৃতিতে এর বহু বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে;

২.১ 'ছয়দফা' কর্মসুচি আর কিছুই নয় সুকৌশলে স্বাধীনতার সংগ্রামকেই অনিবার্য করে তোলা; সুকৌশলে বলছি এ জন্যে যে যুক্ত ফ্রন্টের একশ দফাতেও এ ধরনের কর্মসূচি ছিলো। অতএব নতুন তোলা দেশদ্রোহিতামূলক বিষয় বলে একে আখ্যাত করার সুযোগ তিনে রাখেননি;

৩. তাঁর অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর নিষ্ক্রিয় অসহযোগে ছিলো না, ছিলো সক্রিয় অসহযোগ। এব্যাপারে তিনিই নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন, আমরা তাঁদের (দখলদার পাকবাহিনী) ভাতে মারবো, পানিতে মারবো। তবে তিনি নৈরাজ্য, ধ্বংসাত্মক কাজ ও সাধারণ পাকিস্তানী নাগরিকদের উপর যাতে সামান্যতম অত্যাচার ও জুলুম না হয় সে ব্যাপারেও কড়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, গোটা বাঙালি জাতির সম্মানের কথা, 'এমন কিছু করবেন না, যাতে বাঙালির বদনাম হয়;

৩.১ তাঁর নির্দেশে মরহুম তাজউদ্দীন আহমেদ অসহযোগের যে নীতিমালা তৈরি করেছিলেন তা ছিলো এক মেধাবী ও মোক্ষম দলিল; এখাবেই শেখ সাহেব ভাবি বাংলাদেশের দায়িত্ব হাতে নিচ্ছিলেন।

৩.২ বঙ্গবন্ধুর কোনো কোনো সমালোচক বলেন তিনি কোনো প্রস্তুতি না নিয়েই একটি অসম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যাচ্ছিলেন। এ সমালোচনা যুক্তিতে টেকে না। কারণ;

ক. সম-শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করার মত সামরিক শক্তি তখন বাঙালির ছিলো না; পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে সেটা সম্ভবও ছিলো না;

খ. ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ও দিক নির্দেশক ভাষণের পর পরই আকস্মিকভাবে ক্যান্টনমেন্ট দখল হতো একটি এ্যাডভেঞ্চার, এতে বহু লোক ক্ষয় হতো কিন্তু ফলাফল কি হতো তা নিশ্চিত, নয়। তবে যক্তিতে বলে এ চেষ্টা সফল হতো না এবং বাংলাদেশ আন্দোলন পিছিয়ে যেত;

গ. আন্তর্জাতিক আইনে আমরা বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে প্রতিপন্ন হতাম এবং বিভিন্ন দেশের সহমর্মিতা ও বিশ্ব জন সমর্থন হারাতাম। কেউ কেউ ইরানে শাহ বিরোধী আন্দোলন ও ফিলিপিনসে কোরাজন একুইনোর নজির দেখাতে পারেন, কিন্তু ওই দুই দেশের কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতার ভিত্তি-কেন্দ্র, সেনাবাহিনীর গঠন ও তাদের ব্যবহারোপযোগী বিন্যাস আর আমাদের অবস্থা ও অবস্থানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিলো;

৩.৩ সেনাবাহিনীর বাঙালি অংশের শক্তি ছিলো দুর্বল, তাঁর একটা বড় অংশে দেশপ্রেম থাকলেও অন্য অংশে দ্বিধা ছিলো। এমনকি তাঁরা একত্রে হয়ে বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন দিলেও সে শক্তি হতো পাক-বাহিনীর তুলনায় খুবই দুর্বল; অতএব আঘাতের পর জনগণকে নিয়ে প্রত্যাঘাত অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প ছিলো না;

৩.৪ জনগণের সমর্থন, বিক্রম ও লড়াকু মনোভাবই ছিলো বঙ্গবন্ধুর মূল অস্ত্র। তাই তিনি রণনীতিও রণকৌশল সে-ভাবেই গ্রহণ করেন। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ একজন রাজনৈতিক -কবির মাস্টারপিসই শুধু না- বাস্তব বোধ, কান্ড জ্ঞান, কৌশল ও সঠিক দিক নির্দেশনার ও এক অমূল্য দলিল এবং গেরিলা যুদ্ধের এক নিখুঁত কর্মপরিকল্পনা; বেসরকারী লোকেরা সামরিক ট্রেনিং নিয়ে এর প্রস্তুতিও নিচ্ছিলো দেশের সর্বত্র;

৩.৫ ৭ই মার্চের ঐ ঐতিহাসিক ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম', 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে এবং ২৩শে মার্চ নিজ বাড়িতে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সব আয়োজনই সম্পন্ন করে দিয়েছিলেন। এসবই সবুজ সংকেত হিসেবে যথেষ্ট। তবু তিনি ২৫শে মার্চের রাতেও একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন;

৪. বঙ্গবন্ধ এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন যা ভারতীয় উপমহাদেশে একেবারেই নতুন। এটা পাকিস্তানের মতো অদ্ভুত রাষ্ট্র নয়, এমনকি ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর চেয়েও উন্নত ধরনের পাকিস্তান ও ভারত ভাগ হয়েছিলো ধর্মের ভিত্তিতে যা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক এবং আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুমোদিত নয়। যদিও পণ্ডিত নেহেরু, মওলানা আজাদ ও তাঁদের সহকর্মীরা ভারতকে পরে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন;

৪.১ বাংলাদেশই উপমহাদেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে উঠা এক আধুনিক রাষ্ট্র। ভৌগোলিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্রসীমানা, ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং যুগ যুগ ধরে এই ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে বিকশিত জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও মননধারাগত বিকাশ এ নবীন প্রজাতন্ত্রের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণরূপ লাভ করবে এটিই এ রাষ্ট্রের অঙ্গীকার;

৪.২ স্বল্পসময়ে একটি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, তার ওপর গণভোটের মত সাধারণ নির্বাচন ১৯৭৩, বিপুল পুনর্গঠন উদ্যোগ, বহুদেশের স্বীকৃতি আদায়, আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন, দ্বিতীয় বিপ্লবের কমসূচিতে বাধ্যতামূলক সমবায়, শোষিতের গণতন্ত্র প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ খুবই উল্লেখযোগ্য;

৪.৩ তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশ হবে সুইজারল্যান্ডের মতো একটি রাষ্ট্র। এখানে বিশাল সেনাবাহিনী না রেখে ওই অর্থ শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সামাজি উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে। এটাও ছিলো তাঁর আধুনিক ও জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।

৫. রাষ্ট্রীয় চার মৌলনীতি ঃ হাজার বছরের শ্রেয়বোধ ও কল্যাণচেতনা এবং জনগণের মৌলিক বিশ্বাস ও জীবন-সাধনার সারাৎসার চয়ন করে জনগণের আশা-আকাঙ্খা রূপায়িত হয়েছিলো চার রাষ্ট্রীয় মৌলনীতিতে। জাতীয়তাবাদ অর্থহীন ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া, সে অর্থে আধুনিক রাষ্ট্রের মূল পরিচয় চিহ্ন ধর্ম নিরপেক্ষতা। বাংলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে সকল ধর্মের সহঅবস্থান, ধর্মীয় সহনশীলতা ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এখানকার সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য; ধর্ম নিরপেক্ষতাই এখানকার জনমানসের প্রধান প্রবণতা। বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম তিনটি ধর্মই এখানে নিজেদেরকে সমন্বিত করেছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে। শাস্ত্রীয় ধর্মের পাশেই গড়ে উঠেছে মানবিক, প্রতিবাদী, এস্টাবলিসমেন্ট বিরোধী লোক-ধর্ম। এর বীজ আছে এখানকার আদিবাসীদের সাধনায়, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিবাদী চেতনায়, বেদ উপনিষদের গণমুখী চর্চায়, ইসলামের মানবিক সুফিবাদীও মরমী সাধনায়, বৈষ্ণব বাউল ও রামকৃষ্ণ পরম হংসদেবের চিন্তন ও সহজিয়া ভাবনায়, লোক সাহিত্য ও লোক জীবনের এক সর্বজনীন ও মানবিক চৈতন্যে ভাস্কর বোধে;

সকল আধুনিক রাষ্ট্রই ধর্ম-নিরপেক্ষ হলেও প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার ও ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম-পালনের স্বাধীনতাই ধর্ম-নিরপেক্ষতার মুল কথা। ধর্ম-নিরপেক্ষতা সেই অর্থে, রাষ্ট্র থেকে ধর্মের উচ্ছেদ নয়। তবে ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ থাকা আবশ্যিক শর্তের অন্তর্গত।

সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক, ও ধর্মান্ধ শক্তি ও তার দেশীয় অনুচররা এই বিশাল ও দৃঢ় গণভিত্তি সম্পন্ন জাতীয় নেতা ও বাংলাদেশের প্রধান স্থপতিকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর জাতীয়তাবাদকে পরিবর্তন করেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে সামনে আনা হয়েছে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে। প্রথম কথা হল ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় আমাদের জাতি পরিচয় নির্ধারিত হয়েছে, 'বাঙালি' হিসেবে; নৃতাত্ত্বিক পরিচয়েও তাই। জাতীয় পরিচয় যেমন আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠে না তেমনি কোনো কর্তার নির্দেশে পাল্টায় না। এটা কর্তার ইচ্ছায় কর্মের ব্যাপার না। কিন্তু জিয়াউর রহমান সাহেব তাই করে বসলেন। বাঙালির ইতিহাস এবং বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকাতেই তিনি এক প্রতারক ফাঁদে পা দেন। 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের জনক আসলে পাকিস্তানেত্ম জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের শ্রী বসন্ত চ্যাটার্জি। জুলফিকার ভুট্টো বাংলাদেশকে বলতেন 'মুসলিম বাংলা'। সাম্রাজ্যবাদের ইঙ্গিতে বসন্ত চ্যাটার্জি একটি বই লিখলেন, ইন সাইড বাংলাদেশ টু-ডে ৭৪ নামে। এই বইয়ে বলা হলো মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব এবং ত্রিশলক্ষ মানুষের হত্যার পর 'মুসলিম বাংলা' গ্রাহ্য হবে না।বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বললে তাকে গ্রহণযোগ্য করানো যাবে অথচ জাতীয়তাবাদের কনটেন্টে 'মুসলিম' বাংলা ঠিকই এসে যাবে। এই আইডিয়া লুফে নেন মরহুম খোন্দকার আবদুল হামিদ ও তার সহযোগীরা। আর তিনিই জিয়াউর রহমান সাহেবকে এই জিনিষ রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করাতে সক্ষম হন।

আমাদের একটা জুজুর ভয় দেখানো হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ হলে নাকি ভারতের পশ্চিম বাংলা আমাদের গিলে ফেলতো। দেশ স্বাধীন হবার পর পরই বঙ্গবন্ধু যখন বিচক্ষণতার সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিতে ভারতকে বাধ্য করাতে পেরেছিলেন তখন গিলে খাওয়া রোধ করার শক্তি ও প্রজ্ঞা বঙ্গবন্ধুর ছিলো। তিনি এত দুর্বল ছিলেন না যে জীবনব্যাপী সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীন দেশকে অন্যের কাছে সঁপে দেবেন।

পশ্চিম বাংলা আশা-আকাঙ্খা ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে মিশে গেছে। আমাদের আশা-আকাঙ্খা আলাদা, আমরা কিছু স্বকীয়তা নিয়ে নিজেদের ভিন্নভাবে নির্মাণ করছি, আমরাই মূল ও প্রকৃত বাঙালি, আমাদের কেউ গিলে খেতে পারবে না, বঙ্গবন্ধুর ভাষায় 'দাবায়ে রাখতে পারবে' না।

৫.১ এ কালে তৃতীয় বিশ্বের জন্যে একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দর্শন হলো প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, শোষিতের (অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষের জন্য) গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। এই চারের মধ্যেই তিনি খুঁজেছিলেন তাঁর দুঃখী মানুষের কল্যাণ আর হতে চেয়েছিলেন সারা পৃথিবীর নির্যাতত মানুষের সংগ্রামী সাথী। বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাধ্য হয়ে তিনি 'বাকশাল' গঠন করেছিলেন। নৈরাজ্যের জন্য জনগণ তাঁকে 'কঠোর' হতে বলেছিলো। তিনি সকলকে নিয়ে বাকশালের মাধ্যমে কঠোর হতে চেয়েছিলেন। বাকশালকে স্বৈরাচারী কায়দায় 'একদল' গঠন বলা কিছু কঠিন। এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু তিনি নিজের দলেরও বিলুপ্তি ঘটিয়েছিলেন। দলে নিয়েছিলেন আমলা, সেনাবাহিনীর সদস্য ও প্রখ্যাত কমিউনিস্টদেরও। এটাকে একদল না বলে সকল দল, মত ও পেশাজীবীদের জাতীয় সরকার বলা যেত। তিনি নিজেই বলেছিলেন বাকশাল গঠন তাঁর সাময়িক নৈরাজ্য রোধক পদক্ষেপ। এর মধ্যদিয়ে তিনি দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্যজোট গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন- চেয়েছিলেন দেশগড়ার জন্য 'সোনার মানুষের একটি ক্যাডার আর বিপুল জনতার ঐকমত্য। দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির জন্য অর্থাৎ ভূমি সংস্কার, বাধ্যতামূলক সমবায় এবং রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের বিকাশের জন্য সৎলোক নিয়োগ করে মৌলিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন।

তিনি নিহত হওয়ার পর বিবিসি'র ভাষ্যে বলা হয়েছিলো, 'পৌনে দুইশত বছরের বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর তিনি এক মৌলিক সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন;

৫.২ অফিস আদালতে বাংলা প্রচলনের কঠোর ব্যবস্থাও তিনি নিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীসহ সকল অফিসে বাংলা প্রচলন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো তাৎপর্যপূর্ণভাবে। বাংলা একাডেমীতে সাঁটলিপি, মুদ্রাক্ষর ও নথি লেখার প্রশিক্ষণ নেবার ধুম পড়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু এসব ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন, গৌরব বৃদ্ধি হয়েছিল বাংলাদেশের নবীন প্রজাতন্ত্রের এবং বাঙালি জাতির।

৫.৩ বঙ্গবন্ধু বাংলা নববর্ষকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়েছিলেন। তিনি ১৩৮২ (১৯৭৫)র বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বিশ্বের সকল রাষ্ট্র প্রধানকে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা (গুণটানা) কার্ড পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এর উত্তরে তাঁরা বাঙালির নববর্ষে বাংলাদেশের জনগণের সুখও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

৫.৪ বাংলাদেশের বিপুল মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিলো নানা পেশা ও জীবিকার তাগিদে। এ যেন প্রথমবারের মতো বাঙালিও তার সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী প্রসারও মিথস্ক্রিয়ার তাৎপর্যময় সূত্রপাত। বাঙালির জন্য গোটাবিশ্বের দ্বার খুলে যাওয়া।

'মানুষের প্রতি বিশেষ হারানো পাপ'

রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর আস্থা ছিলো সুগভীর। মানুষকে বিশ্বাস করতেন, ভালবাসতেন- মঙ্গল কামনা করতেন সকল মানুষের। এই গুণকে আমরা মহৎ বলতে পারি, বলতে পারি মহামানবের গুণ। তিনিতো মহামানবই ছিলেন। আর ছিল তাঁর মহামানবের সরলতা। কূটিলতা আর কূটবুদ্ধি তাঁর ছিলো না। এটা যেমন তাঁর মানবিক সরলতা তেমনি একালের জন্য এক দুবলতাও। সকল মহৎ মানুষের মতো এই সরলতা ও দুর্বলতাই মুজিব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এটা তিনি নিজেও জানতেন। একবার এক বিদেশী সাংবাদিকের এক কূটপ্রশ্নের উত্তরে অসামান্য উত্তর দিয়েছিলেন তিনি। সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল ঃ

'স্যার, হোয়াট ইজ ইয়োর কোয়ালিফিকেশনস? বঙ্গবন্ধুর উত্তরঃ আই লাভ মাই পিপল'। তুখোড় সাংবাদিকও দমবার পাত্র নন। তার দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ হোয়াট ইজ ইয়োর ডিসকোয়ালিফিকেশনস দেন? উত্তর ঃ আই লাভ দেম টু মাচ। এতে বঙ্গবন্ধুর শুধু প্রত্যুৎপন্নমতিত্বই না আত্মমূল্যায়নেরও এক চমৎকার নির্দেশ মিলে।

মানুষের প্রতি এই প্রগাঢ় বিশ্বাসের জন্যই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে। খুনিরা তাঁর বাড়িতে গিয়েছে, তাঁর ভালোবাসা পেয়েছে কিন্তু চরম বিশ্বাসঘাতকের মতই তাঁর গোটা পরিবারের উপর চালিয়েছে বিনাশী আক্রমণ।

বঙ্গবন্ধু সরল ছিলেন, সরলতা তাঁর কাছে মহামানবের উদারতা। দু'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির এইটেই ভূষণ হওয়া উচিত। ক্ষুদ্র মাপের কোনো কোনো 'বুদ্ধিজীবী' বঙ্গবন্ধুর এই সরলতা দেখেই বলতেন, শেখ মুজিবের বুদ্ধিশুদ্ধি কম। ঠিকই তো, তিনি, ধুরন্ধর ছিলেন না, চালাকি দিয়ে কেরিয়ার গড়তে চাইতেন না। এ সবতো ক্ষুদ্র মাপের মানুষের অস্ত্র। তবে তাঁর বুদ্ধির ধার ছিলো, তাঁর একটি মাত্র উদাহরণ সাংবাদিকের উপরোক্ত প্রশ্ন ও তার উত্তর। প্রখর কাণ্ডজ্ঞান ছিলো তাঁর, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার পারঙ্গমতা ছিলো, আর ছিলো অসাধারণ সংগঠন প্রতিভা আর লোকপ্রিয়তা। এই সব কিছু মিলিয়েই বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের 'মুজিব' বা মজিবর আর বাংলাদেশের মহান স্থপতি।